بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

জুমুআর খুতবার সারাংশ (৯ জুলাই- ২০১০)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ৯ জুলাই, ২০১০ এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ উপস্থাপিত হচ্ছে।

তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের নির্দয় আক্রমনে লাহোরস্থ আহমদীয়া মসজিদে নির্মমভাবে নিহত শহীদদের স্মৃতিচারণ করবো। আজ আমি সর্ব প্রথম উল্লেখ করবো **শহীদ জনাব এহসান আহমদ খাঁন, পিতা– জনাব ওয়াসিম আহমদ খাঁন সাহেব এর** কথা। শহীদ মরহুমের বড় দাদা হযরত মুন্সী দিয়ানত খাঁন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তারা কাংড়ার অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানে লন্ডনে কর্মরত মুরব্বী সিলসিলাহ্ জহির আহমদ খাঁন সাহেব শহীদ মরহুমের চাচা হন। শহীদ মরহুমের আরেক ভাই নাদিম আহমদ খাঁন সাহেব জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পড়াশোনা করছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। দারুয্ যিক্র মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। দুর্ঘটনার দিন ফজরের নামাযের পর কুরআন তিলাওয়াত করে কর্মক্ষেত্রে যাবার পূর্বে স্ত্রীকে বলেন, 'গত শুক্রবার জুমুআর নামায পড়া হয়নি, আজ আমি দারুয যিক্র মসজিদে জুমুআর নামায পড়বো', মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এরপর দুপুরে তাঁর মা'কে ফোন করে মসজিদে সন্ত্রাসী আক্রমনের সংবাদ দেন তারপর আর কোন যোগাযোগ হয়নি। সন্ত্রাসীদের গ্রেনেডের আঘাতে গুরুতর আহত হন, পরে সন্ত্রাসীরা চলে গেছে গুজব শুনে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলে পুনরায় গ্রেনেডের আক্রমনে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে রাবওয়াতে সমাহিত করা হয়। শাহাদতের এক মাস পূর্বে তাঁর মা স্বপ্নে দেখেন, 'তাঁর ছেলে শহীদ হয়েছে এবং তাঁর মরদেহ উঠানে রাখা হয়েছে। আমি (হুযূর) তাঁর মুখে স্নেহের সাথে হাত বুলাচ্ছি এবং বলছি, কি হয়েছে?' শাহাদতের কয়েক দিন পূর্বে শহীদ মরহুম নিজে স্বপ্নে দেখে ভীত-ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠেন। মাকে শুধু বলেন, 'খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি', এরপর তিনি সদকা দেন। শহীদ মরহুম একজন ঈমানদার ও পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। অন্যদের সাথে সহমর্মিতা ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। আন্তরিকতার সাথে পিতামাতার সেবা-যত্ন করতেন। দেড় বছর আগে তিনি বিয়ে করেছেন এবং তাঁর চার মাস বয়সী একটি ওয়াকফে নও কন্যা সন্তান আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন।

শহীদ জনাব মনোয়ার আহমদ কায়সার সাহেব, পিতা– জনাব মিয়াঁ আব্দুর রহমান সাহেব। শহীদ মরহুমের পরিবার কাদিয়ানের অধিবাসী ছিল। কাদিয়ানের পর পাকিস্তানের গুজরাঁওয়ালা এবং পরবর্তীতে লাহোর স্থানান্তরিত হন। শহীদের পরিবারের সর্বপ্রথম আহমদী হযরত আব্দুল আযীয সাহেব (রা.) আড়তদার, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব মিয়াঁ দোস্ত মোহাম্মদ সাহেবের চাচাতো ভাই ছিলেন। তাঁর দাদা এবং পরিবারের অন্যরা দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়'আত করেন। পেশায় তিনি একজন চিত্রগ্রাহক ছিলেন। গত প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি শুক্রবার দারুয্ যিক্র মসজিদের মূল ফটকে ডিউটি দিয়েছেন। দারুয্ যিক্র মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। কর্তব্যরত অবস্থায় কয়েকবার তিনি এ কথা বলেছেন, 'যদি কেউ আক্রমণ করে তবে তাকে আমার লাশের উপর দিয়ে ভেতরে যেতে হবে'। দুর্ঘটনার দিন প্রায় এগারটার সময় তিনি ডিউটিতে যোগ দেন। ১:৪০ মিনিটে সন্ত্রাসীরা এসেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে। তিনি এক সন্ত্রাসীকে জাপটে ধরে ফেললে আরেক সন্ত্রাসী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে ফলে ঘটনাস্থলেই তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, জুমুআর নামাযে যাবার পূর্বে আমি তাঁকে সোনালী রং-এর শার্ট ইস্ত্রি

করে দেই এবং বলি, আজ আপনি বরের পোশাক পড়েছেন। তিনি একজন গুণী ও দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন। কখনো কোন অভিযোগ করেন নি। নিয়মিত নামায আদায় করতেন। অনেক সময় বিরোধীরা তাঁর চোখের সামনেই তাঁর দোকানের বাইরে বিরোধিতামূলক পোষ্টার লাগিয়ে যেতো, তিনি তাদের সাথে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ করতেন না, বরং পরে তা উঠিয়ে ফেলে দিতেন। শহীদ মরহুম সবসময় তাঁর ছেলেকে বলতেন, 'কেউ যদি তোমার সাথে কোন বাড়াবাড়ি করে তবে সেখান থেকে চুপচাপ চলে আসবে। যদি তুমি উত্তর দাও তবে তুমি বিষয় নিজের হাতে নিয়ে নিলে, আর যদি আল্লাহ্ তা'লার উপর ছেড়ে দাও তবে অবশ্যই আল্লাহ্ এর প্রতিশোধ নিবেন'।

শহীদ জনাব হাসান খুরশীদ আওয়ান সাহেব, পিতা– জনাব খুরশীদ আওয়ান সাহেব। শহীদ মরহুম চাকওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা জন্মগত আহমদী ছিলেন। দারুয্ যিক্র মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। মসজিদে সন্ত্রাসীদের আক্রমনের পর বাসায় ফোন করে বলেন, 'আমি আহত হয়েছি, দোয়া করুন'। এরই মাঝে সন্ত্রাসীদের আরেকটি গুলিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। পরিবারের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনের চাপের মুখে হয়ে বাধ্য হয়ে শহীদের পিতা-মাতা জামাতকে সংবাদ দেয় যে, 'আহমদীরা জানাযার নামায পড়লে এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, কারণ এখানে খতমে নবুয়ত সংগঠন বেশ উগ্র। এই অজুহাত দেখিয়ে আহমদীদেরকেও জানাযার নামায পড়তে দেয়া হয় নি। অ-আহমদীরাই তাঁর জানাযা পড়েছে এবং সমাহিত করেছে। তাঁর পিতা প্রথমে বিরোধীদের ভয়ে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত জামাতের কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর তাকে বুঝানো হয় যে, 'আপনার ছেলে জীবন দিয়ে এ বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেছে যে, প্রাণ গেলেও জগতের মানুষকে ভয় করো না, কারো ভয়ে শহীদ মরহুমের আত্মত্যাগ গোপন করা তাঁর সাথে অবিচারের শামিল'; বুঝানোর সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেয় নি। শহীদ সম্পর্কে চাকওয়ালের আমীর সাহেব লিখেছেন, তিনি তবলীগের কোন সুযোগই হাতছাড়া করতেন না। গত কয়েক বছর পূর্বে শহীদের পিতা জনাব খুরশীদ আহমদ সাহেব জামাত থেকে দূরে সরে গেছেন, কিন্তু মরহুম শহীদ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন এবং তাঁর এই কুরবানী তাঁর আপন জনের চোখ উন্মোচিত করুক।

শহীদ মোহতরম মাহমুদ আহমদ শাদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, পিতা– জনাব চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব। শহীদ মরহুমের পরিবার গুজরাতের অধিবাসী ছিলেন। তাদের বংশে সর্বপ্রথম বয়'আত করেন তাঁর দাদা জনাব ফযল দাদ সাহেব। বয়'আতের পূর্বে শহীদ মরহুমের পিতা খুবই প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিলেন। একবার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'তবলীগে হেদায়াত' নামক জামাতের একটি বই এর কিছু অংশ পড়েন, তারপর আগ্রহ সৃষ্টি হয় আর সম্পূর্ন বইটি পাঠ করে ১৯২২ তিনি বয়'আত করেন। শহীদ মরহুমের পিতা নায়েব তহশীলদার ছিলেন। তিনি কখনোই কারো কাছে থেকে ঘুষ নেন নি। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও খোদাভীরু মানুষ ছিলেন। শহীদ মরহুম ১৯৬২ সালের ৩১ মে জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মসূত্রেই ওয়াক্ফ ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি জামেয়া পাশ করেন। স্থানীয় পর্যায়ে তিনি জামাতের বিভিন্ন সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়াও তিনি মাসিক খালিদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে জামাতের মুরব্বী হিসেবে কাজ করা ছাড়াও তাঞ্জানিয়াতে দীর্ঘ ১১ বছর জামাতের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। গত তিন মাস পূর্বে তিনি মডেল টাউনের বায়তুন্ নূর মসজিদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্র ফযলে তিনি মুসী ছিলেন আর বায়তুন্ নূর মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। শাহাদতের দিন নতুন কাপড় পড়ে নতুন রুমাল নিয়ে আর দুই রাকাত নফর নামায পড়ে ছেলেকে সাথে নিয়ে জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসেন। প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা বলেছে, আক্রমনের সময় তিনি বারবার দোয়া করার প্রতি মুসল্লীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিলেন। আক্রমনকারী যখন মসজিদের মূল কক্ষে প্রবেশ করে তখন তিনি উচ্চস্বরে 'নারায়ে তকবীর', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিও উত্তোলন করেন এবং অনবরত দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন। দু'টি গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়েছিল ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্র কৃপায় তাঁর ছেলে নিরাপদ রয়েছে। শহীদ মরহুমের স্ত্রী বলেন, শাহাদাতের একদিন পূর্বে ২৭ মে রাতে এম.টি.এ'তে খিলাফত শতবার্ষিকির অঙ্গীকার পুনঃপ্রচারিত

হচ্ছিল তিনি উচ্চস্বরে এ অঙ্গীকার পাঠ করেন এবং জুমুআর নামাযের পর জামাতের সকল সদস্যকে এই অঙ্গীকার পাঠ করানোর ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ভিন্ন ছিল।

শহীদ মরহুমের স্ত্রী বলেন, তাঞ্জানিয়াতেও খিদমতের সময় তাঁর বিরোধীতা হয়েছে এবং সেসময়ও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের বিভিন্ন নিদর্শন তিনি দেখেন। ১৯৯৯ সালে আহমদী বিরোধী এক মৌলভী শেখ সাঈদী মুরব্বী সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি কিছু লোককে বে-আইনীভাবে তাদের মিশন হাউসে আশ্রয় দিয়েছেন। পুলিশ মিশন হাউসে তল্লাশী চালানোর পর মুরব্বী সাহেবকে থানায় নিয়ে যায়। মুরব্বী সাহেব থানায় তাঁর নিজের এবং জামাতের পরিচয় দিলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে স্বসম্মানে তাঁকে মুক্তি দেন। কিন্তু এর কিছুদিন পর সৌদী সরকার একই অভিযোগে শেখ সাঈদীকে সৌদি আরব থেকে বহিস্কার করে আর এ সংবাদ পত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে।

তাঞ্জানিয়াতে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় একবার জামাতী সফরে যাবার সময় তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, আমার ম্যালেরিয়া জ্বর, শরীর ভাল না আর আপনি চলে যাচ্ছেন? মুরব্বী সাহেব বলেন, **'আমি আল্লাহ্‌র কাজ করতে যাচ্ছি আর তোমাকেও আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে যাচ্ছি।'**

শহীদের স্ত্রী বলেন, লাহোরের মডেল টাউনে নিয়োগ পাবার পর থেকেই টেলিফোনে বিভিন্ন হুমকি আসতে শুরু করে। মুরব্বী সাহেব বলেন, **'আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি, যদি তুমি আমার কুরবানী নিতে চাও তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার সন্তানদেরকে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রেখো'**। শহীদ কয়েক বোনের একমাত্র ভাই ছিলেন। অসুস্থ মায়ের সেবা-যত্নের গভীর প্রেরণা রাখতেন। পরিস্থিতি যখন খারাপ হচ্ছিল তখন মুরব্বী সাহেবের বোনেরা ফোন করে ভাইকে ছুটি নিয়ে তাদের কাছে বেড়াতে যেতে বললে, তিনি বলেন, **'যেখানে সাধারণ আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে সেখানে আমি কেন কুরবানী না করে মাঠ ছেড়ে পালাবো'**। এ অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ তিনি অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকেন আর বলেন, শহীদদের পরিবারকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো নষ্ট করেন না বরং তিনি স্বয়ং তাদের সুরক্ষার বিধান করেন'। শহীদ মরহুমের তবলীগ করার প্রতি খুবই আগ্রহ ছিল। শহীদ হবার এক মাস আগে একজন ডাক্তার সাহেবের সাথে দু'তিন বার বৈঠক করেন আর লাগাতার কয়েক ঘন্টা তাঁকে তবলীগ করেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহাম এবং উদ্ধৃতি একান্ত আবেগের সাথে পাঠ করে শুনান। এতে ডাক্তার সাহেব খুবই আবেগ প্রবণ হয়ে যান এবং বলেন 'আজ আমার পালানোর আর কোন পথ নেই। যে ব্যক্তি আবেগাপ্লুত হয়ে আমাকে তবলীগ করছেন তাঁর জামাত কি করে মিথ্যা হতে পারে? আজ আমার সকল সংশয় দূর হয়েছে'। এরপর ডাক্তার সাহেব বয়'আত করেন। মুরব্বী সাহেবের পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন গয়ের আহমদী। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে তবলীগ করেছেন।

শহীদ মরহুম যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা খুবই মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং জামাতের সদস্যদেরকেও শুনার জন্য উপদেশ দিতেন। কখনো কোন জামাতের ডিশ এন্টিনা নষ্ট হয়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না। তিনি একান্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং হাসি-খুশি থাকতেন। প্রত্যেকের সাথে বন্ধুত্বসুলভ এবং প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা হতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি এবং নযমের পংক্তি পাঠ করতেন। শত্রুর ব্যর্থতা ও নিরাশ হওয়া এবং জামাতের সফলতা সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আর বীরত্বের সাথে তা ঘোষণা করতেন। খিলাফত এবং জামাতের ব্যাপারে সামান্য কোন কথাও যদি কেউ বলতো তাহলে সাথে সাথে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।

তাঁর সম্পর্কে আরেকজন মুরব্বী সাহেব লিখেন- শহীদ প্রফুল্ল চিত্তে বড়-বড় বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতেন। তিনি সাহসী ও নির্ভীক এবং তবলীগ-পাগল মানুষ ছিলেন। আমার যখন তাঞ্জানিয়াতে পোষ্টিং হলো, তখন তাঁর সাথে দারুল ইসলাম থেকে মোরোগোরো যাচ্ছিলাম। রাস্তার পাশে কিছু মৌলভী চোখে পড়ল। মাহমুদ শাদ সাহেব গাড়ি থামালেন এবং তাদেরকে তবলীগ করতে আরম্ভ করলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল আর রাস্তাও ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু ততক্ষণে সেখানে

মানুষ ভীড় করে তাঁর কথা শুনতে থাকে, অবশেষে তিনি মৌলভীদেরকে নির্বাক করে সেখান থেকে পালাতে বাধ্য করেন। গাড়িতে বসার সময় আমাকে বলেন, 'এই দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে তাই ভীত হবেন না, প্রকাশ্যে তবলীগ করবেন'। তাঁর কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বিরোধীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় তিনি তাঞ্জানিয়াতে বেশ কয়েকটি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতের উচ্চস্থানে সমাসীন করুন।

শহীদ জনাব ওয়াসীম আহমদ সাহেব, পিতা– জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেব। শহীদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ নিযাম উদ্দীন সাহেব (রা.) এবং হযরত বাবু কাসেম দ্বীন সাহেব (রা.)-এর বংশোদ্ভুত। এই বংশের সম্পর্ক শিয়ালকোটের সেই মহল্লার সাথে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর দাবীর পূর্বে চাকুরী উপলক্ষ্যে অবস্থান করেছিলেন। আর দাবীর পরও শিয়ালকোট এলে এখানেই অবস্থান করতেন। শহীদ মরহুম শিয়ালকোট থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেইস সাইন্সে বি.এসসি. এবং পরবর্তীতে কম্পিউটার সাইন্সে এম.এসসি. পাশ করেন। শাহাদতের পূর্বে তিনি একটি সফটওয়্যার কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হিসেবে চাকুরী করছিলেন।

শহীদ মরহুম আল্লামা ইকবাল টাউনের মজলিসে আমেলায় নাযেম আতফাল হিসেবে সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে তিনি মুসী ছিলেন আর দারুয্ যিক্‌র মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ৩৮ বছর ছিল। তিনি সর্বদাই দারুয্ যিক্‌র মসজিদে জুমুআর নামায পড়তেন। ঘটনার দিনও অফিস থেকে সরাসরি নামায পড়ার জন্য দারুয্ যিক্‌র-এ এসেছিলেন। সাধারণত প্রথম সারিতে বসতেন, আর ঘটনার দিন সন্ত্রাসী আক্রমনের সময় আমীর সাহেবের নির্দেশে সেখানেই বসে থাকা অবস্থায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহীদ হন। শাহাদতের পর অফিসে সহকর্মীরা তাঁর স্মরণে দু' ঘন্টাব্যাপী শোকশভা করে আর শোক প্রকাশের জন্য তাঁর বাড়ীতে আসেন। এছাড়া দাফনের সময় প্রিয় সহকর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তারা রাবওয়া পর্যন্ত এসেছেন। শহীদের কর্মক্ষেত্রের মহাব্যবস্থাপক তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে করাচি থেকে শিয়ালকোট যান, সেখান থেকে রাবওয়া আসেন এবং একজন বিশ্বস্ত ও বন্ধুবৎসল সহকর্মীর নির্মম শাহাদতে একান্ত মর্মাহত হন।

শহীদের স্ত্রী বলেন, তিনি পিতামাতা ও বুযুর্গদের খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। পিতামাতার সাথে কখনও উচ্চস্বরে কথা বলতেন না বরং একে গুনাহ্ বলে মনে করতেন। জামাতের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। লাহোর জামাতের চাঁদার হিসাব-পত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সফটওয়্যারও তৈরী করেছেন। সন্তানদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শাহাদতের পর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর লাশ লাহোর থেকে শিয়ালকোট নিয়ে যায়। সেখানে জানাযার নামায পড়ার পর সমাহিত করার জন্য রাবওয়াতে নিয়ে আসেন। মরহুমের শাহাদতের বাসনা ছিল প্রবল। প্রায়ই বলতেন, **'যদি আমার জীবনে কখনো এমন সুযোগ আসে তাহলে সর্বাগ্রে আমি আমার বুক পেতে দেব।'** শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি জামাতের কাজ করেছেন। আল্লামা ইকবাল টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক ছিলেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজ সদা প্রফুল্ল চিত্তে করতেন'। শহীদ পাঁচ ভাই-বোনের মাঝে সবচেয়ে বড় ছিলেন। অত্যন্ত যোগ্য, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী যুবক ছিলেন। শহীদ মরহুমের মা তাঁর পড়াশুনার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হুযূর বলেন, তাঁর স্ত্রী আমাকে চিঠিতে লিখেছেন, **'হুযূর তাঁর উত্তম গুণাগুণ হয়তো আমি বর্ণনা করে শেষ করতে পারবো না। কিন্তু যদি আমি বলি যে, তিনি একজন ফিরিশ্‌তা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাহলে তা বাহুল্য হবে না।'** আমি মনে করি, খোদা তা'লা ওয়াসীম সাহেবকে এ সম্মান তাঁর সুমহান ও অনুপম আদর্শের কারণেই দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র পিতামাতা ও আমারই নয় বরং গোটা বংশের মান-মযার্দা বৃদ্ধি করেছে। অফিসের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় তিনি সন্ধ্যাবেলা দারুয্ যিক্‌র-এ মিটিং এর জন্য যেতেন এবং বাজামাত নামায পড়তেন। এছাড়া আর্থিক কুরবানীতেও তিনি সব সময় অগ্রগামী থাকতেন। সব সময় বেতনের এক দশমাংশ চাঁদা দিতেন। আমি আমার দাম্পত্য জীবনে তাঁর কাছ থেকে কোন শক্ত কথা শুনিনি। শাহাদতের পর যখন তাঁর শবদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, তখনও তাঁর চেহারায় সেই হাসি এবং প্রশান্তিই লেগে ছিল। তিনি একজন নির্ভীক মানুষ ছিলেন। আহমদী হবার কারণে তিনি গর্ববোধ করতেন। তিনি তাঁর জুনিয়র সহকর্মীকে বলতেন, **'বন্ধু! শহীদের মর্যাদা লাভ করা সবার**

ভাগ্যে জুটে না'। ঘরেও অধিকাংশ সময় বলতেন, 'তবলীগ করতে কখনও ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেননা আমাদের মত গুনাহ্গাররা এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি-সে পাবে? ' যাহোক ঘটনার সময় আটটি গুলি ওয়াসীম সাহেবের পেটে বিদ্ধ হয় আর এর এক ঘন্টার মধ্যেই তিনি শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন।

শহীদ মোকাররম ওয়াসীম আহমদ সাহেব, পিতা– জনাব মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব চাকওয়াল। শহীদ মেট্রিক পাশ করে সেনাবাহিনীতে লান্স নায়েক হিসেবে চাকুরী শুরু করেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসরের পর ইসলামাবাদে একটি সিকিউরিটি কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে ২০০৯ সাল থেকে দারুয্ যিক্র মসজিদে নিরাপত্তা প্রহরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাহাদতের সময় ওয়াসীম আহমদ সাহেবের বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ঘটনার সময় সন্ত্রাসীরা অনেক দূর থেকেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করেছিল। যার ফলে দারুয্ যিক্র মসজিদের মূল ফটকে কর্তব্যরত অবস্থায়– ঘটনার প্রারম্ভেই তিনি শহীদ হন। ১৯৮৩ সালে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ১৯৯০ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, 'তিনি খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। সমাজের সবাই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। সবার সাথেই খুব ভাল সর্ম্পক ছিল। আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিতেও তিনি খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। বিশেষভাবে এতীম ছেলেমেয়েদের সাথে তিনি খুব ভাল ব্যবহার করতেন; তা সে আত্মীয়, অনাত্মীয়, আহমদী, অ-আহমদী যে-ই হোক না কেন। জামাতী সেবার ক্ষেত্রে উদ্দ্যম ও আবেগ ছিল'। তাঁর ছেলে বলেছে, 'আমাদের পিতা খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। আমাদের সাথে খুবই ভাল সর্ম্পক ছিল। আমাদের প্রতিটি ইচ্ছা-আকাঙ্খার মূল্যায়ন করতেন'। তাঁর মেয়ে বলেন, 'বিশেষভাবে আমার সব আবদারই তিনি পূরণ করতেন'। সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর মেয়ে বলেন, আমাকে বলতেন, 'আমি তোমাদের রাবওয়াতে পাঠিয়ে দিব। সেখানে পড়াশুনার পরিবেশ ভাল। আর আমি নিশ্চিন্তে জামাতের সেবা করবো'। শহীদের স্ত্রী আরো বলেন, লাহোরের আহমদী মসজিদে আক্রমন হবার সংবাদ শুনে আমি ওয়াসীম সাহেবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি, কিন্তু যোগাযোগ করতে পারি নি। তাঁর ফোন নম্বর থেকে অন্য কোন আহমদী ভাই ফোন করে ওয়াসীম সাহেবের শাহাদতের সংবাদ দিয়েছেন। এ সংবাদ শুনে চরম কষ্ট এবং দুঃখ পেয়েছি ঠিকই কিন্তু শাহাদতের মত উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণে খুবই খুশি হয়েছিলাম আর গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছিল। মসজিদে মুসল্লীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে তিনি শহীদ হয়েছেন। শহীদ নিয়মিত নামায পড়তেন এবং বিভিন্ন গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রফুল্লচিত্তে প্রতিটি নেক কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কুরবানীর উত্তম প্রতিদান দিন।

শহীদ জনাব নাযির আহমদ সাহেব, পিতা– ইবনে মিস্ত্রী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব। শহীদ তাঁর পরিবারে একাই আহমদী ছিলেন। আর আহমদীয়াতের কারণে পুরো বংশের বিরোধিতা সহ্য করেছেন। শহীদ জুমুআর নামায পড়ার জন্য নিয়মিত মডেল টাউন এর বায়তুন্ নূর মসজিদে আসতেন। এছাড়া অন্যান্য নামায তিনি নিজ হালকায় অবস্থিত নামায সেন্টারে গিয়ে পড়তেন। বায়তুন্ নূর মসজিদে শাহাদতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনরাই তাঁর নামাযে জানাযা এবং দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করে এবং কোট লাকপাত কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ মরহুম জুমুআর নামায আদায়ের জন্য সবেমাত্র বাইতুন্ নূরে পৌঁছেছিলেন, তখনই সন্ত্রাসীরা আক্রমন হানে এবং তাদের এলোপাতাড়ি গুলির আঘাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হাসপাতালের হিমাগার থেকে আত্মীয়-স্বজনরা শহীদের শবদেহ নিয়ে যায়। পরবর্তীতে দারুয্ যিক্র মসজিদে তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায পড়া হয়। শহীদ মরহুম নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং নামায আদায় করতেন। পরিবারের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আমৃত্যু সত্যের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, 'মেইন বাজারে তাঁর মূল্যবান জমি ছিল আর সেখানে তাঁর দোকান ছিল। তাঁর জীবদ্দশায়ই ভাতিজারা জোরপূর্বক তাঁর দোকান দখল করে নিয়েছিল। এরপর তিনি দারিদ্রের মাঝে গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ও পরিবারের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতা সহ্য করেছেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আহমদীয়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। জামাতের নিয়মিত বাজেটভূক্ত সদস্য ছিলেন। সাদাসিধে পোষাক পরতেন। জুমুআর নামায আদায়ের জন্য

নিয়মিত সাইকেলে চড়ে সময়মত বাইতুন্ নূরে পৌঁছে যেতেন এবং মসজিদে প্রথম কাতারে বসতেন। সবার সাথে প্রফুল্ল চিত্তে সাক্ষাত করতেন এবং মসজিদে আসলে দীর্ঘক্ষণ থাকতেন, আহমদীদের সাথে যত বেশি সময় কাটানো যায় ততই ভাল। বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর ঘরের ভেতরে ও বাইরের অংশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি টাঙ্গানো ছিল। জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল। তবলীগের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি যেখানে বাস করতেন সেখানে বিরুদ্ধবাদীদের আখড়া ছিল তবুও তিনি নির্ভয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ চালিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জান্নাতের উচ্চস্থানে সমাসীন করুন।

শহীদ জনাব মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, পিতা– জনাব নিযাম দ্বীন সাহেব। শহীদ মরহুমের পরিবার গুরুদাসপুরের অধিবাসী ছিল। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেন নি তবে, কুরআন শরীফ পড়তে জানতেন। তাঁর বংশে তিনি এবং তাঁর এক বোন আহমদী ছিলেন। তিনি আমেরিকার শিকাগো জামাতে কতর্বরত মুরব্বী জনাব ইনামুল হক কাউসার সাহেবের মামা। কোয়েটাতে তাঁর আসবাব পত্রের দোকান ছিল। দারুয্ যিক্‌র মসজিদে শাহাদত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। জুমুআর দিন তিনি নিয়মিত সদকা দিতে অভ্যস্থ ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় দারুয্ যিক্‌র মসজিদের মূল কক্ষে ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, শরীরের ডান দিক পুড়ে গিয়েছে আর পেটেও মারাত্তক আঘাত পেয়েছিলেন। সম্ভবত গ্রেনেড বিস্ফোরণে তিনি শহীদ হয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যায় লাহোরের মিও হাসপাতাল থেকে অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন তাঁর লাশ নিয়ে যায় এবং তারাই দাফন করে। তাঁর পরিবারবর্গ জানায়, তিনি নিয়মিত নামায পড়তেন আর যথারীতি জামাতের চাঁদা আদায় করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল না হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় খরচাদী থেকে বাঁচিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গরীব ও অভাবীদের সাহায্য করতেন। জামাতের সাথে খুবই দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরিবারবর্গ আরো জানিয়েছেন, বার্ধক্যের কারণে তিনি ভুলে যেতেন যে, আজ কি বার। তাঁর পরিবারের সবাই ছিল অ-আহমদী। তাই তারা শুক্রবার এলে তাঁকে জানাত না যে, আজ জুমুআর দিন। শহীদ মরহুম একজন ফকিরের আগমনকে চিহ্ন স্বরুপ নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন যে, এই ফকির জুমুআর দিন আসে। কখনো ভুলে গেলে ঐ ফকিরকে দেখে বুঝতেন যে, আজ জুমুআর দিন। তাঁর বড় ছেলে বলেছে, রাতে সাধারণত তাঁকে বিছানায় পাওয়া যেত না। খুঁজে দেখা যেত– জায়নামাযে দাঁড়িয়ে তিনি নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বলতেন, **'আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলে বায়েতদের ভালবাসি। কিন্তু তাদের প্রতি তোমাদের মধ্যে কোন ভালবাসা নেই। স্বপ্নে আহলে বায়েতদের সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছে'।** জামাতের এবং খলীফাদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে চেনার সৌভাগ্য দান করুন।

হুযূর বলেন, বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে এই স্মৃতিচারণ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে শহীদদের জীবনের কিছু মূল্যবান দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু পূর্বে আমি শহীদ জনাব ড. উমর আহমদ সাহেবের বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছি। তাঁর স্ত্রী পরবর্তীতে কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাঠিয়েছেন, তিনি শৈশব থেকেই শাহাদতের প্রবল বাসনা পোষণ করতেন। বিভিন্ন উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন আর সর্বদা জামাতের সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নেকী কবুল করুন এবং নিজ করুণায় তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান।

এরপর হুযূর বলেন, এরই মাধ্যমে শহীদদের স্মৃতিচারণ শেষ হল। শহীদদের যে বিবরণ আমি তুলে ধরলাম তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুণ যা সবার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন নামাযের সুব্যবস্থা করা, শুধু নিজের জন্যই নয় বরং নিজ সন্তানদের এবং পরিবার বর্গকেও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আর নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে ফোনে বাচ্চাদের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। আবার কেউ মসজিদ ও নামায সেন্টার দূরে থাকায় নিজ ঘরেই বাজামাত নামায আদায়ের ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেক শহীদের মাঝে জুমুআর নামাযের প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ আমরা দেখতে পাই। কেউ কেউ ঘর থেকে বের হবার সময় বলেছেন, হয়ত আজ জুমুআর নামাযে পৌঁছতে বিলম্ব ঘটে যাবে। কিন্তু যখন জুমুআর সময় হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে,

সব কাজ ফেলে জুমুআর নামাযের জন্য মসজিদে পৌঁছে গেছেন। আবার অনেকে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য বিশেষ উদ্দ্যোগ নিতেন। আবার অনেকে নফল নামাযের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। অনেক যুবক শহীদ বা বয়স্ক শহীদের মাঝেও শাহাদত বরণের প্রবল বাসনা ছিল। এছাড়া তাদের উন্নত নৈতিক গুণাবলী আপন-পর সবাই দেখেছে। তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এবং বন্ধু-বান্ধবসহ সবার শুভাকাংখী ছিলেন। জামাতের সেবা করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। শহীদদের সহধর্মিণীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া গেছে। শহীদদের উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে কেবল তাঁদের জীবন সাথীরাই সাক্ষ্য দেননি বরং তাঁদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রাখত এমন প্রত্যেকেই তাঁদের উত্তম চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, **'যে ব্যক্তি মানবাধিকার প্রদান করে না, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালন করে না সে খোদা তা'লার আদেশও পালন করে না। যদিও সে বাহ্যতঃ নামায আদায়কারী কিন্তু মানবাধিকার প্রদান না করার কারণে তাঁর ইবাদতও বৃথা হয়ে যায়।'**

অতএব সকল শহীদ যাঁরা শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, নিশ্চিত এই শাহাদাতের মর্যাদা তাদের ইবাদতের গ্রহণীয়তা এবং মানবাধিকার প্রদানের প্রমাণ বহন করে। আমরা আরও দেখতে পাই, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইবাদত এবং উত্তম আচরণের মাঝেই তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকেন নি বরং নিজেদের দায়িত্বও সুচারুরূপে পালন করেছেন। একজন পিতা পরিবারের কর্তা হবার সুবাদে সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়ত এবং সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। এই আবশ্যকীয় দায়িত্বের প্রতিও তাঁরা যত্নবান ছিলেন এবং প্রত্যেক শহীদের মাঝে এই গুণাগুণ আমরা দেখেছি। কাজেই এরাই হলেন সেইসব মানুষ যারা আত্মত্যাগ করে সন্তানদের এবং জামাতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এছাড়া এমন অনেক যুবক শহীদ হয়েছেন যাঁদের পিতা-মাতা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনও জীবিত আছেন। ঐ যুবকরা শাহাদত বরণের পূর্বে তাঁদের পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করেছেন, তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন। খোদা তা'লার আদেশ, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর এবং তাদের কোন কথায় কষ্ট পেয়ে মুখ থেকে উফ্ শব্দটুকুও উচ্চারণ করো না। তাঁরা এই নির্দেশ শতভাগ পালন করেছেন। অনেক সময় এমন হয় যে, বিবাহিত যুবকরা পিতা-মাতার অধিকার প্রদান করতে গিয়ে স্ত্রীর অধিকার প্রদান করতে দুর্বলতা দেখান কিন্তু শহীদদের স্ত্রীরা বলেছেন, তাঁরা পিতা-মাতার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি আমাদের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রেখেছেন, কখনো কোন অভিযোগ বা অনুযোগ করার সুযোগ দেন নি। শহীদদের মা-বাবা বলেন, আমাদের অধিকার প্রদান করতে গিয়ে কখনো স্ত্রী-সন্তানের প্রতি যেন কোন অবিচার না হয় সেদিকেও তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। অতএব শহীদরা একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং নিজেদের জীবনকে জান্নাত-প্রতিম করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে কত বড় মহান পুরস্কার দিয়েছেন আর তাঁদেরকে স্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন, তাদেরকে স্বীয় নৈকট্য দান করুন। শহীদগণ তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর মাধ্যমে তাঁরা আমাদের বলে গেছেন যে, **হে আমাদের প্রিয়রা! হে আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! হে আমাদের সন্তানেরা, হে আমাদের মায়েরা, হে আমাদের বোনেরা হে আমাদের কন্যারা! আমরাতো সাহাবাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের বয়'আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি। কিন্তু বিদায় বেলায় তোমাদের কাছে আমাদের শেষ প্রত্যাশা, এই পুণ্য ও বিশ্বস্ততার মর্যাদাকে চিরঞ্জীব রেখো।**

হুযূর বলেন, অনেকে আমাকে পত্র লিখেছেন, আপনি আজকাল শহীদদের স্মৃতিচারণ করছেন, তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত শুনে ঈর্ষা হয়। তাঁরা কতইনা পুণ্যবান এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। আত্মবিশ্লেষণ করে আমরা লজ্জায় মরে যাই, এই সুমহান মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য আমাদের হবে কি? এমন চিন্তা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা খুবই ভাল। কিন্তু যারা উন্নতি করতে চায় তাদের মাঝে কেবল এই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং এসব পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিদায়ী ব্যক্তির অন্তিম ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও তাঁদের ত্যাগকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা আবশ্যক।

শহীদদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে নিজ সুরক্ষার বেষ্টনীতে স্থান দিন। তাদের দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্টকে দূর করুন এবং তাদের সাহায্যকারী বন্ধু হোন। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন তবুও মানবীয় দুর্বলতার কারণে সে চেষ্টায় কোন না কোন ত্রুটি থেকেই যায়। আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি সত্যিকারের প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেন। কাজেই শহীদদের উত্তরাধিকারীদেরকেও আপনারা দোয়ায় স্মরণ রাখবেন আর নিজেদের জন্যও বেশি বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শত্রুর সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দোয়ার উপর জোর দিন, পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ ঘটনার পর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বরং বিরোধিতা আরও বেড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে নিজ নিজ স্থানে দৃঢ় এবং অবিচল থাকার তৌফিক দিন।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) সিরিয়া জামাতের সাবেক আমীর জনাব নাযীর শফিকুল মুরাদনী সাহেব এর মৃত্যু সংবাদ দেন। তিনি গত ৩০ জুন ২০১০ সালে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন انا لله وانا اليه راجعون। মরহুম ১৯৬৩ সালে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে গবেষণা করে সত্য অনুধাবন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৬ সালে তাকে মজলিস আনসারুল্লাহ্ সিরিয়ার প্রথম সদর এবং ১৯৮৮ সালে সিরিয়ার আমীর মনোনীত করেন। তিনি জামাতের প্রতি খুবই অনুগত এবং বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। লেখালেখির অভ্যাস ছিল। তাঁর রচিত আটিটি বই প্রকাশিত হয়েছে। অতিথি সেবক হিসেবে তার সুনাম রয়েছে। সিরিয়া জামাতের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ মোসাল্লাম আদ্দুরাবী সাহেব বলেন, যখন আমাকে সিরিয়ার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয় তখন তিনি এতটাই আন্তরিকতা, আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করেন যা দেখে আমি অবাক হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার আত্মীয়-স্বজনদেরকে এ শোক সইবার ক্ষমতা দিন। জুমুআর নামাযের পর হুযূও (আই.) মরহুমের গায়েবানা জানাযার নামায পড়ান।

(প্রাপ্তসূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)